শিশু অধিকার প্রতিষ্ঠা এবং মাতৃদুগ্ধদানের গুরুত্ব ও তাৎপর্য

[বাংলা – Bengali – بنغالي]

ড. হুসাইন আহমাদ

সম্পাদনা : ড. মোঃ আবদুল কাদের

2011-1432

IslamHouse.com

﴿ حقوق الأطفال وأهمية الرضاعة الطبيعية ﴾

« باللغة البنغالية »

د. حسين أحمد

مراجعة: د. محمد عبد القادر

2011 - 1432

IslamHouse.com

শিশু অধিকার প্রতিষ্ঠা এবং মাতৃদুগ্ধদানের গুরুত্ব ও তাৎপর্য

আজকের শিশু আগামী দিনের ভবিষ্যৎ। অথচ বর্তমান বিশ্বের অসংখ্য শিশু মৌলিক অধিকারসহ বিভিন্ন প্রকার অধিকার হতে বঞ্চিত হচ্ছে। ফলে অপুষ্টি ও নানা প্রকার রোগ-শোকে ভুগছে। বিশেষ করে দরিদ্র জনগোষ্ঠীর শিশুদের মৌলিক মানবাধিকার তথা অন্ন বস্ত্র বাসস্থান চিকিৎসা ও শিক্ষার অধিকার অপূর্ণ থেকে যাচ্ছে। তাছাড়া অনেক ক্ষেত্রে অত্যাচার-নির্যাতন ও অমানুষিক শিশু শ্রমের কারণে সম্ভাব্য কুঁড়ি অকালেই ঝরে যাচ্ছে। পরিতাপের বিষয় হলো বর্তমান আধুনিক বিশ্বেও কোন কোন ক্ষেত্রে শিয়াল কুকুরের সাথে ডাস্টবিনে ফেলে দেয়া খাবারে সর্বশ্রেষ্ঠ সৃষ্টি মানুষ অংশগ্রহণ করছে। এ অধিকার বঞ্চিত মানুষ অন্যায়-অত্যাচার মাদকাশক্তি ও সন্ত্রাসের মত জঘন্যতম কাজে জড়িয়ে সমাজে সমস্যা সৃষ্টি করছে। অথচ সামান্য সচেতন হলে সকল সম্ভাবনা আশ্রয় ও শিশুদের সম্পদে পরিণত করা যায়। নবজাতক শিশু ফলবান বৃক্ষের সাথে তুল্য। একটি চারাকে

উত্তমরূপে পরিচর্যা করলে যেমন মজবুত কান্ড ও পত্র পল্লবে সুশোভিত পূর্ণাঙ্গ বৃক্ষে পরিণত হয়ে কাংক্ষিতরূপে ফলদান করতে সক্ষম হয়। তেমনি উত্তমরূপে পরিচর্যা করলে প্রতিটি শিশু সুস্থ্য সবল এবং সুঠাম দেহের অধিকারী পূর্ণাঙ্গ মানুষ হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে। যাদের দ্বারা আমরা আগামী দিনে সোনালী ভবিষ্যৎ গড়তে পারি। এ ক্ষেত্রে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো মাতৃগর্ভ থেকে শিশু অধিকার নিশ্চিত করা। তাছাড়া শিশুর ভবিষ্যৎ গড়ার ব্যাপারে মাতৃদুগ্ধদানের সুদূরপ্রসারী ভূমিকা রয়েছে। শিশু অধিকার প্রতিষ্ঠা এবং মাতৃদুগ্ধদানের গুরুত্ব ও তাৎপর্য শীর্ষক প্রবন্ধে এ বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে। বর্তমান সময়ের চাহিদা অনুসারে এ প্রবন্ধটি যথার্থ নির্বাচন। এ প্রবন্ধ শিশু অধিকার প্রতিষ্ঠা এবং মাতৃদুগ্ধদানের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে মানুষকে সচেতন ও উৎসাহী করবে ইনশাল্লাহ।

মানব সভ্যতায় পিতা-মাতা ও সন্তানের পারস্পারিক সম্পর্ক অত্যন্ত নিবিড়, তাছাড়া পারস্পারিক গ্রহণযোগ্যতা, দায়িত্ব ও কর্তব্য অধ্যাধিক। তাই শৈশব থেকে সন্তানকে প্রাপ্য অধিকার প্রদান ও উত্তর আচার-আচারণের দ্বারা আদর্শ মানুষ হিসেবে গড়ে তুলতে হবে। কেননা মানব সন্তানের শৈশব হল কাঁদা মাটির

ন্যায়, শৈশবে তাকে যেমন ইচ্ছা তেমন গড়ে তোলা যায়। স্থায়ীত্ব ও প্রভাব বিস্তারের দিক থেকেও শৈশবকালীন শিক্ষা মানব জীবনে সুদূরপ্রসারী ভূমিকা রাখে। শৈশবকালীন শিক্ষা সম্পর্কে বলা হয়ে থাকে:

العلم في الصغر كالنقش على الحجر.

"শৈশবে বিদ্যার্শন (স্থায়ীত্বের দিক থেকে) পাথরে খোদাই করা ভাস্কর্যের ন্যায়।"[1] ইসলাম চৌদ্দশ বছরের অধিককাল যাবত শিশুদের বিষয় গুরুত্বারোপ করে আসছে এবং শিশু পরিচর্যার বিষয়টিকে ইসলামের মৌলিক নীতিমালার অন্তর্ভুক্ত করত তাকে একটি সার্বক্ষণিক পালনীয় বিধানে পরিণত করেছে। ইসলাম যে শিশুর জন্ম মূর্হুত থেকেই তার অধিকারের কথা ঘোষণা করেছে তা নয়, বরং তার জন্মের পূর্ব থেকেই তার অধিকার নির্ধারণ করে দিয়েছে। ইসলামী দৃষ্টিতে শৈশব হচ্ছে সৌন্দর্য, আনন্দ, সৌভাগ্য ও ভালবাসার পরিপূর্ণ এক চমৎকার জগত। সন্তানকে পার্থিব জীবনের সৌন্দর্যের ঘোষণা পবিত্র কুরআনে এসেছে,

---

[1] . আবু বকর আহমদ ইবন হুসাইন, 'আলী আল-বায়হাকী মাদখাল ইলা সুনানিল কুবর (কুয়েত, দারুল যুলকা লিলকিতাবিল ইসলাম, খৃ. ১৪০৪), পৃ. ৩৭৫।

“ধন সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি হচ্ছে পার্থিব জীবনের সৌন্দর্য বিশেষ।”(সূরা কাহাফ:)[2] সুতরাং পার্থিব জীবনের সুখ শান্তি ও সৌন্দর্য এ শিশুকে ভবিষতে সম্পদ হিসেবে গড়ি তোলার জন্যে শিশু অধিকার প্রতিষ্ঠা করা একান্ত প্রয়োজন। পিতা-মাতার উপর সন্তানের অনেকগুলো অধিকার রয়েছে।

বৈধভাবে জন্মগ্রহণ করার অধিকার

জন্মগত বৈধতা ইসলামের পরিবার গঠনের ভিত্তি এবং শিশুর ন্যায্য অধিকার। অবৈধ সন্তান না হবার জন্য নানারূপ সাবধনতা অবলম্বন করতে হবে, এ ক্ষেত্রে অবৈধ যৌনমিলন থেকে বিরত থাকতে হবে। কেননা অবৈধ যৌনমিলনের ফলে মাবনদেহে নানারকম রোগ-ব্যাধির সৃষ্টি হয়। উপরন্ত এতে অবৈধ সন্তান জন্মের আশংকা থাকে। এতে কোন সন্দেহ নেই যে, অবৈধ সন্তান মানবিক অধিকার হতে অনেক ক্ষেত্রে বঞ্চিত হয় এবং তার জীবন ধারণ ও লালন পালনের সুযোগ-সুবিধা সহজলভ্য হয় না। যদিও পিতা-মাতার অপরাধ সন্তানের উপর

---

[2] . আল-কুরআন, ১৮:৪৬।

বর্তায় না তবুও সমাজ অবৈধ সন্তানকে পূর্ণ সামাজিক মর্যাদা দিতে সম্মত নয়।[3] এটা যথেষ্ট নয় যে কোন শিশু তার পিতার নামে পরিচিত। এটা সত্যা হলেও চলবে না, বরং সকল সত্যের উর্ধ্বে এটা সত্য হতে হবে। শিশুকে যেন এ বিষয়ে লজ্জিত হতে না হয়। জাহেলিয়া বা অজ্ঞতার যুগে সন্দেহজনক পিতৃত্ব নিয়েও কোন কোন হতভাগ্য শিশুকে চলতে হতো। একাধিক ব্যক্তি একটি শিশুর পিতা ব‡ল দাবী করত এবং দাবীর সমর্থনে যুক্তিও পেশ করত। বিষয়টি রাসুল (সা.) কে অত্যন্ত ব্যাথিত করে। তিনি ঘোষণা করেন "যে পিতার শয্যায় (বা সংসারে) সন্তান জন্ম গ্রহণ করে, শিশু সেই শয্যারই।"[4] ইসলামের বিধান হলো যে পরিবারে সন্তান জন্ম গ্রহণ করে, সন্তান সেই পরিবারের যদি না বিষয়টি চ্যালঞ্জ হয়।

এরূপ একটি সীদ্ধান্ত প্রচলিত আছে যে, বিয়ের ৬ মাসের মধ্যে যে শিশু জন্ম গ্রহণ করে তার জন্মের বৈধতা নিয়ে প্রশ্ন করা

---

[3] . আফীক আব্দুল ফাত্তাহ তাববারা, অনু. *ইসলামী দৃষ্টিতে অপরোধ,* (ঢাকা: ইফাবা, পৃ. ১৯৮৬), পৃ. ১০৯।

[4] . আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ ইবন ইসমাইল আল-বুখারী, *সহীহ বুখারী,* (দিল্লী: কুতুবখানা রশীদিয়াহ, তা.বি), পৃ. ৭৮৭।

বৈধ নয়। যদি কোন পিতা তার স্ত্রীর আনুগত্যহীনতার কারণে সন্তানকে নিজের সন্তান বলে পরিচয় দিতে না চায়, তাহলে তাকে অবশ্যই অবিশ্বাস করা যায় না,তাকে চারজন সাক্ষী উপস্থিত করতে হবে। যদি সে সাক্ষী উপস্থিত করতে ব্যর্থ হয়, তবে তাকে লিয়ান[5] পদ্ধতি অবলম্বন করতে হলেও শিশুর পিতার পরিচয় সন্দেহমুক্ত করতে হবে। লিয়ান এর পদ্ধতি সম্পর্কে আল-কুরআনে এরশাদ হয়েছে:

﴿وَٱلَّذِينَ يَرۡمُونَ ٱلۡمُحۡصَنَٰتِ ثُمَّ لَمۡ يَأۡتُواْ بِأَرۡبَعَةِ شُهَدَآءَ فَٱجۡلِدُوهُمۡ ثَمَٰنِينَ جَلۡدَةً وَلَا تَقۡبَلُواْ لَهُمۡ شَهَٰدَةً أَبَدًاۚ وَأُوْلَٰٓئِكَ هُمُ ٱلۡفَٰسِقُونَ ٤ إِلَّا ٱلَّذِينَ تَابُواْ مِنۢ بَعۡدِ ذَٰلِكَ وَأَصۡلَحُواْ فَإِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ٥ وَٱلَّذِينَ يَرۡمُونَ أَزۡوَٰجَهُمۡ وَلَمۡ يَكُن لَّهُمۡ شُهَدَآءُ إِلَّآ أَنفُسُهُمۡ فَشَهَٰدَةُ أَحَدِهِمۡ أَرۡبَعُ شَهَٰدَٰتِۭ بِٱللَّهِ إِنَّهُۥ لَمِنَ ٱلصَّٰدِقِينَ﴾ [النور: ٦- ٩]

---

[5] . 'লিয়ান' স্বামী যদি স্ত্রীর বিরুদ্ধে যিনার অভিযোগ উত্থাপন করে এবং উহার অনুকুলে প্রয়োজনীয় সংখ্যক(৪ জন) সাক্ষী না থাকে, অথবা সে যদি স্ত্রী গর্ভস্থ সন্তানকে তার ঔরসজাত নয় বলে দাবী করে, তবে এ অবস্থায় তাদের উভয়কে বিশেষ পন্থায় আদালতের সামনে যে শপথ করতে হয় তাকে 'লিয়ান' বলে। (ইসলামী আইন বিধিবদ্ধকরণ বোর্ড, বিধিবদ্ধ ইসলামী আইন, (ঢাকা: ইফাবা, খৃ. ১৯৯৫), পৃ. ৬৭৬।

“যারা নিজেদের স্ত্রীদের বিরুদ্ধে যেনার অভিযোগ উত্থাপন করে, অথচ নিজেরা ব্যতীত তাদের (প্রয়োজনীয় সংখ্যক) সাক্ষী নাই, তাদের প্রত্যেকের সাক্ষ্য এই হবে যে, সে (স্বামী) আল্লাহর নামে চারবার শপথ করে বলবে যে, সে অবশ্যই সত্যবাদী এবং পঞ্চম বারে বলবে, সে মিথ্যাবাদী হলে তার নিজের উপর আল্লাহর অভিশাপ পড়বে। তবে স্ত্রীর শাস্তি রহিত হবে যদি সে (স্ত্রী) আল্লাহর নামে চারবার শপথ করে সাক্ষ্য দেয় যে, তার স্বামী মিথ্যাবাদী, এবং পঞ্চম বারে বলবে, তার স্বামী সত্যবাদী হলে তার নিজের উপর আল্লাহর অভিশাপ পড়বে।”[6]

সুন্দর নাম পাবার অধিকার

নাম একটি জাতির স্বকীয়তা ও পরিচয়ের ক্ষেত্রে অন্যতম নিয়ামক মাধ্যম। এ প্রসঙ্গে উইলিয়াম হাজলিটের (William Hajlitt) সাবলীল বক্তব্য প্রণিধানযোগ্য। তিনি বলেন:

---

[6] . আল-কুরআন, ২৪:৬-৯।

A mane fast anchored in the deep abyss of time is like a star twinkling in the firmament cold, distant, silent, but eternal and sublime.”[7]

নাম কালের অতল তলে আবদ্ধ নোঙর, যেন দূর নীলিমায় মিটিমিটি তারকা, শান্ত, সুদূর সমাহিত; কিন্তু শাশ্বত সুউন্নত। একটি সুন্দর বা উত্তম নাম পাওয়া প্রতিটি সন্তানের পিতা-মাতা তার হক বা অধিকার হিসেবে শরিয়ত স্বীকৃতি দেয়। হযরত আবু হুরায়রা (রা.)এ প্রসঙ্গে এক হাদীস উল্লেখ করেন:

রাসূল (সা) বলেছেন, পিতা-মাতার প্রতি সন্তানের হক হচ্ছে প্রথমত: তিনটি

1. জন্মের পরে তার জন্য একটি উত্তম নাম রাখতে হবে।
2. জ্ঞান বুদ্ধি হলে তাকে উত্তম শিক্ষা দিতে হবে।
3. পূর্ণবয়স্ক হলে তার বিয়ের ব্যবস্থা করতে হবে।[8]

---

[7] . Willian Hajlitt. Ibid

[8] . ইসলামিক ফাউন্ডেশনের ইমাম প্রশিক্ষণ একাডেমী প্রকাশিত গণশিক্ষা শীর্ষক পুস্তক, পৃ. ১০৩।

ইবন আববাস (রা) থেকে বর্ণিত অপর এক হাদীসে তিনি বলেন, তারা বললো, ইয়া রাসুলুল্লাহ! আমরা অবগত হয়েছি যে, পিতার হক কি; কিন্তু সন্তানের হক কি? তিনি বললেন, পিতা (সন্তানকে) সুন্দর নাম ও সুশিক্ষা প্রদান করবে।[9]

ইবন আববাস ও আবু সাঈদ (রা.) অন্যত্র বর্ণনা করেন- রাসূল (সা.) এরশাদ করেন, যার সন্তান জন্মগ্রহণ করে সে যেন সুন্দর নাম ও সুশিক্ষা দেয় এবং সাবালক হলে তার বিয়ে দেয়।[10]

ইসলামে নামের গুরুত্ব অপরিসীম। আল্লাহ তাওআলা প্রথম মানব হযরত আদম (আ.) কে সৃষ্টি করে সর্বপ্রথম তাকে নামই শিক্ষা দিয়েছিলেন। পবিত্র কুরআনে এ সম্পর্কে বলা হয়েছে:

﴿وَعَلَّمَ ءَادَمَ ٱلۡأَسۡمَآءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمۡ عَلَى ٱلۡمَلَٰٓئِكَةِ فَقَالَ أَنۢبِـُٔونِي بِأَسۡمَآءِ هَٰٓؤُلَآءِ إِن كُنتُمۡ صَٰدِقِينَ ٣١﴾ [البقرة: ٣١]

---

[9] . বাযহাকী, এ হাদীসটিকে কেউ কেউ দুর্বল বর্ণনা মনে করলেও বক্তব্যের দিক থেকে এ সংক্রান্ত মৌলিক বক্তব্যের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ বিধায় গ্রহণীয় হতে পারে।

[10] . প্রাগুক্ত।

“আর তিনি আদমকে যাবতীয় নাম শিক্ষা দিলেন, তৎপর সে সমুদয় ফিরিশতাদের সম্মুখে প্রকাশ করলেন এবং বললেন, ‘এ সমুদয়ের নাম আমাকে বলে দাও।’[11] পরবর্তী আয়াতে দেখা যায় এরপর ফেরেস্তাদের কাছে এ সকল জিনিসের নাম জানতে চাইলে তারা অজ্ঞতা প্রকাশ করে। তখন আদম (আ.)কে জিজ্ঞাস করলে তিনি তা বলে দেন। এর মাধ্যমে আল্লাহ তাওআলা আদম (আ.) কে ফেরেস্তাদের উপর শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করেন।[12] নামের গুরুত্ব বুঝা যায় যখন সকল কাজের শুরুতে আল্লাহর নাম উচ্চারণের নির্দেশ আসে। এর মধ্যে কিছু কাজ আছে যা আল্লাহর নামে শুরু করা ফরজ। যেমন, সালাত, তায়াম্মুম ও পশু যবেহ ইত্যাদি। এ সম্পর্কে পবিত্র কুরআনের নির্দেশ এসেছে এভাবে:

“আপনি আপনার প্রতিপালকের নাম স্বরণ করুণ এবং একনিষ্ঠভাবে তাতে মগ্ন থাকুন।[13] তাফসীরকারদের মতে এ আয়াতে তাকবীরে তাহরীমার কথা বলা হয়েছে, যার আগে আল্লাহর নাম উচ্চারণ করা ফরজ। শুধু কি কাজের আগেই বরং

---

[11] . আল-কুরআন, ২:৩১

[12] . আল-কুরআন, ২:৩৩।

[13] . আল-কুরআন, ৭৩:৮।

পবিত্র কুরআনে নাযিলকৃত প্রথম আয়াতের নির্দেশও ছিল মহান আল্লাহ্ তাআলার নামে পাঠ করার। যেমন এরশাদ হয়েছে:

﴿ ٱقۡرَأۡ بِٱسۡمِ رَبِّكَ ٱلَّذِي خَلَقَ ﴾ [العلق:٨]

"পাঠ করুন আপনার প্রতিপালকের নামে।[14] এতে বুঝা গেল যে, কিছু নির্দিষ্ট ক্ষেত্রে কাজ শুরুর আগে আল্লাহর নাম উচ্চারণ ফরজ। এছাড়া অন্যান্য ক্ষেত্রে আল্লাহর নাম উচ্চারণের প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। হাদীস শরীফের সূত্রে আহকামুল কুরআনে বর্ণিত হয়েছে- খাবার সময় বান্দাহ যদি আল্লাহর নাম উচ্চরণ করে, তাহলে শয়তান তার সাথে খেতে বসতে পারে না। আর নাম উচচারণ না করলে অবশ্যই তার খাবারে শয়তান শরীক হবে। মুশরিকরা তাদের কাজ-কর্ম শুরু করে তাদের দেব-দেবী মূর্তির নামে, যাদের তারা পূজা করে, ওদের বিরোধিতা করা হবে যদি আল্লাহর নাম উচ্চারণ করে কাজ শুরু করা হয়।[15]

---

[14] . প্রাগুক্ত, ৯২:১।

[15] . আল্লামা আবু বকর আহমাদ আল-জাস্সাস(র.) , *আহকামুল কুরআন,* খ. ১, অনুবাদ মাওলানা মুহাম্মাদ আব্দুর রহীম, (ঢাকা: ইফাবা, খৃ. ১৯৮৮), পৃ. ২৩।

সুতরাং নাম কোন ক্ষুদ্র বিষয় নয়, যে রাখতে হয় তাই রাখা। বরং এর মাধ্যমে পরিচয়ের এক শাশ্বত ধারার সূচনা ঘটে। ফলে বিশ্ব মণীষীরাও নামের গুরুত্ব না দিয়ে পারে নি। কিন্তু তা অর্থবোধক, শ্রুতিমধুর বা অন্য কোন আঙ্গিকে বিবেচনার সুযোগ রয়েছে, এ বিষয়ে মতান্তরের অবকাশ লক্ষ করা যায়। সন্তানের নাম রাখার ক্ষেত্রে মুসলমানদের গাফলতির সুযোগ নেই। তাই শিশুকে সার্বিক দিক থেকে সুন্দর নাম দিতে হবে। যে ধরনের নাম নিয়ে অন্যরা হাসাহাসি করে, সে ধরনের নামে শিশুকে ডাকা যাবে না। এ সম্পর্কে রাসূল (সা.) এরশাদ করেছেন: "তোমরা সুন্দর নাম রাখ।"[16]

বেঁচে থাকার অধিকার

ইসলামে শিশু হত্যা নিষিদ্ধ। তা দরিদ্রতার ভয়, পারিবারিক সুনাম-সম্মান রক্ষা করা অথবা অন্য যে কোন কারণেই হোক না কেন। জাহেলিয়াত যুগে আরব দেশে কন্যা সন্তানকে জীবন্ত কবর

---

[16] . আবু দাউদ সুলাইমান ইবন আশআস সিজিস্তানী, *সুনানু আবি দাউদ,*(দিল্লী: কুতুবখানা রশিদিয়াহ, তা.বি), পৃ. ৫২।

দেয়া হত। এ ধরণের অমানবিক প্রথাকে ইসলামে কঠোরভাবে নিন্দা এবং নিষিদ্ধ করা হয়েছে। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তাআলা এরশাদ করেছেন:

﴿وَلَا تَقْتُلُوٓاْ أَوْلَٰدَكُم مِّنْ إِمْلَٰقٍ نَّحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ﴾ [الأنعام :١٥١]

দারিদ্রতার কারণে তোমাদের সন্তানদেরকে হত্যা করবে না। আমি তোমাদেরকে এবং তাদেরকে রিযিক দিয়ে থাকি।"[17] অন্যত্র বলা হয়েছে:

﴿وَلَا تَقْتُلُوٓاْ أَوْلَٰدَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَٰقٍ نَّحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْـًٔا كَبِيرًا﴾ [الإسراء:٣١]]

দারিদ্রের ভয়ে তোমাদের সন্তানদেরকে হত্যা করো না। তাদেরকে এবং তোমাদেরকে আমি রিযিক দিয়ে থাকি। নিশ্চয় তাদেরকে হত্যা করা মহাপাপ।[18] যে সন্তান প্রসবিত হয়নি, দুনিয়ার আলো দেখেনি মাতৃগর্ভে থাকা কালেও তার বেঁচে থাকার অধিকার আছে। ভ্রূণে জীবন এসে গেলে তাকে হত্যা করা যাবে না। কারো কারো মতে ৪০ দিনে জীবন আসে কারো কারো মতে

[17] . আল-কুরআন, ৬: ১৫১।

[18] . আল-কুরআন, ১৭:৩১।

৪ মাসে। জীবন এসে গেলে গর্ভপাত সম্পূর্ণ হারাম। কোন কোন ফকীহ বা আইনবিদের মতে যৌনমিলনের ফলে ভ্রূণ সৃষ্টি হলে গর্ভপাত হারাম।[19]

সুস্থতার অধিকার

প্রত্যেকটি মানব শিশুরই সুস্থ শরীর নিয়ে জন্মগ্রহণ করার মানবিক অধিকার রয়েছে। কথা খুবই স্বাভাবিক যে, একজন পুষ্টিহীন মা কখনই সুস্থ শিশুর গর্বিত মা হতে পারে না। এ জন্যে মায়ের পুষ্টির ব্যাপারে অতিরিক্ত যত্ম নেয়া প্রয়োজন। তাছাড়া গর্ভস্থিত ভ্রূণের ঠিকমত গঠন ও বৃদ্ধির জন্য মাকে সুষম ও বাড়তি খাবার দিতে হবে। এ বাড়তি খাবার মায়ের স্বাভাবিক খাদ্য হতে ২০০ থেকে ৩০০ ক্যালোরী বেশী যোগাবার উপযোগী হবে। নিম্নে একজন সাধারণ কর্মক্ষম স্বাভাবিক মহিলা ও গর্ভবতি মায়ের কতখানি খাদ্য গ্রহণ করা উচিত তার একটি তালিকা দেয়া হল:

---

[19] . এ.বি. রফিক আহমাদ ও মুহাম্মদ মুসা, *ইসলামে শিশু পরিচর্যা* (ঢাকা: ইফা, খৃ. ১৯৮৭), পৃ. ৫২।

খাদ্য দ্রব্যের নাম	স্বাভাবিক মহিলা	গর্ভবতী মহিলা
চাল/ডাল	৩৫০ গ্রাম	৩৭৫ গ্রাম
ডাল	৪০ ”	৬০”
মাছ/গোশত/ডিম	৬০ ”	৬০”
আলু/মিষ্টিআলু	৬০ ”	৬২”
যেকোন শাক	১৫০ ”	১৮০”
যে কোন সব্জী	৯০ ”	৯০”
চিনি/গুড়	---------	৩০”
ফল	১টা ৫৫ ”	১টা/ ৫৫”
তৈল/ঘি	৪০ ”	৫০”
খাদ্য শক্তি	২১০০ কিঃ ক্যাঃ	২৩৬০ কিঃ ক্যাঃ প্রায়[20]

তাছাড়া রোগগ্রস্ত পিতা-মাতার সন্তান উত্তরাধিকার সূত্রে রোগাক্রান্ত হওয়াই স্বাভাবিক অসুস্থ হওয়া পিতা-মাতার জন্য কোন

[20] অধ্যাপক মাওলানা মোঃ তমিজ উদ্দিন, আবু উবাইদ মোঃ মহসিন মাওলানা কাজী আবু হুরায়রাঃ পরিবার কল্যাণ, ইমাম প্রশিক্ষন একাডেমী, ইসলামিক ফাউন্ডেশন, বাংলাদেশ খৃ. ১৯৯৪ পৃ. ৮৭।

অপরাধ নয়। কিন্তু অসুস্থতার সময়ে যৌনমিলনে অনেক সময় জটিলতার সৃষ্টি করে। তাছাড়া অবৈধ ও মাত্রাতিরিক্ত যৌনমিলনের ফলেও কতকগুলো রোগে শিশু জন্ম থেকে আক্রান্ত হয়। যৌন আক্রান্ত পিতা-মাতার সন্তান পঙ্গু এবং অন্ধ হলে জন্ম নিতে পারে। এ সম্পর্কে হাদীসের বাণী: কোথায় তোমার বীর্য স্থাপন করবে তা চিন্তা-ভাবনা করে স্থির করে নাও। বংশধারা যেন সঠিক হয়।[21] রক্ত সম্পর্কীয় আত্মীয়ের সাথে বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপিত হলে জন্মগত অক্ষমতা সৃষ্টি হতে পারে। তাদের দেহ ক্ষীর্ণকায় ও মেধা নিম্নমানের হতে পারে। এতদ্ব্যতীত যে সমস্ত রোগ পিতা-মাতার থেকে সন্তানের মধ্যে সংক্রমিত হয় সে সম্পর্কে সতর্কতা অবলম্বন করা খুবই জরুরী।[22]

মাতৃদুগ্ধ পান

একটি শিশু আত্মপ্রকাশ করার সাথে সাথেই শাখা যেরূপ তার মূলের প্রতি মুখাপেক্ষী থাকে, শিশুও তার মায়ের প্রতি সে

---

[21] . সহীহ বুখারী, পৃ. ৭৬০।

[22] . আবদেল রহীম উমরান, ইসলামী ঐতিহ্য পরিবার পরিকল্পনা (অনু. শামছুল আলম, ঢাকা-১৯৯৫), পৃ. ৭৫।

রকম মুখাপেক্ষী থাকে। সে মায়ের গর্ভে থাকাকালীন রক্তরূপে যে আহার্য গ্রহণ করতো এখনও তাকে অনুরূপ আহার্য গ্রহণ করতে হয়। তবে এ রক্ত আল্লাহর বিশেষ কুদরতে তাঁর জ্ঞান ও ইচ্ছায় দুগ্ধে পরিণত হয় যা শিশুর শরীর গঠনে প্রয়োজনীয় সকল উপাদানে সমৃদ্ধ। আর এ দুগ্ধ প্রবাহিত মায়ের স্তনে এসে উপনীত হয় এবং শিশু আল্লাহর বিশেষ দিক নির্দেশ তার সন্ধান প্রাপ্ত হয়ে চুষতে থাকে। আল-কুরআনে এমন সব নীতিমালার কথা উল্লেখ করা হয়েছে যা মাতৃদগ্ধদানের বিষয়ে মানুষকে উৎসাহিত করে এবং মা ছাড়া অন্য মহিলার স্তন থেকে দুগ্ধপান করার ক্ষেত্রে তার দুগ্ধদান সম্পর্কিত নীতিমালা নিয়ন্ত্রণ করে। এ প্রসঙ্গে পবিত্র কুরআনে আল্লাহ এরশাদ করেন:

﴿وَٱلۡوَٰلِدَٰتُ يُرۡضِعۡنَ أَوۡلَٰدَهُنَّ حَوۡلَيۡنِ كَامِلَيۡنِۖ لِمَنۡ أَرَادَ أَن يُتِمَّ ٱلرَّضَاعَةَۚ﴾ [البقرة: ٢٣٣]

“যে জননী সন্তানদেরকে পুরো সময় পর্যন্ত দুগ্ধপান করতে ইচ্ছে রাখে, তাঁরা নিজেদের শিশুদের পুরো দু’বছর ধরে দুগ্ধ পান

করাবে।”[23] এ আয়াত দ্বারা স্তন্যদান সংক্রান্ত নিম্নোক্ত দিক-নির্দেশনা পাওয়া যায়:

এক. শিশুকে স্তন্যদান মাতার জন্য ওয়াজিব। সামর্থ্য থাকলে মা যেন তাঁর সন্তানকে তার স্তন্যপান থেকে বঞ্চিত না করে, ক্রোধের বশর্বতী হয়ে বা অসন্তুষ্টির কারণে শিশুকে স্তন্যদানের অধিকার থেকে বঞ্চিত করা বৈধ নয়।[24] বিবাহ বন্ধনে থাকাকালীন স্ত্রী স্বামীর নিকট থেকে স্তন্যদানের জন্য কোন প্রকার বেতন বা বিনিময় গ্রহণ করতে পারবে না। তবে তালাকপ্রাপ্ত স্ত্রী বা স্তন্যদানে নিয়োগকৃত ধাত্রী বিনিময় গ্রহণ করতে পারবে।[25]

দুই. উক্ত আয়াতে স্তন্যদানের সময়সীমা দু'বছরের কথা বলা হয়েছে। ইমাম শাফয়ী, সাবেবাইন' [26]স্তন্য দানের সময়সীমা

---

[23] . আল-কুরআন, ২: ২৩৩।

[24] . মুফতী মুহাম্মদ শাফী, মা'আরেফুল কুরআন(হারামাইন শরীফাইন ফাহাদ কুরআন মুদ্রণ প্রকল্প, হি. ১৪১৩), পৃ. ১৩০।

[25] . ড. মুহাম্মদ মুস্তফিজুর রহমান, তাবিলাত আহলুসসুন্নাহ (আব্দুল মানসুর আল-মাতুরুদী), ঢাকা: ইফাবা, খৃ. ১৯৮৬), পৃ. ৫৮৪।

[26] . 'সাহেবাইন' ফিকহশাস্ত্রে ইমাম আবু ইউসুফ ও ইমাম মুহাম্মদকে একত্রে সাহেবাইন বলা হয়। ইসলামী জ্ঞানকোষ, মুহাম্মদ রফিকুল ইসলাম, ঢাকা: আল বারাকা লাইব্রেরী), পৃ. ১২৮।

দু’বছর বলে মত প্রকাশ করেছেন। তবে ইমাম আবু হানিফা ও ইমাম যুফারের একমত স্তন্যদানের সময়সীমা আড়াই বাছর বা ত্রিশ মাস বলা হয়েছে।[27] তারা তাদের মতের পক্ষে আল্লাহ তা’আলার দলীল হিসেবে পেশ করেছেন:

﴿وَفِصَٰلُهُۥ ثَلَٰثُونَ شَهۡرًاۚ﴾ [الأحقاف:١٥]

“তার গর্ভ ও দুধপান করানোর সময়কাল ত্রিশ মাস।”[28] অন্যত্র এ প্রসঙ্গে বলা হয়েছে:

﴿وَوَصَّيۡنَا ٱلۡإِنسَٰنَ بِوَٰلِدَيۡهِ حَمَلَتۡهُ أُمُّهُۥ وَهۡنًا عَلَىٰ وَهۡنٖ وَفِصَٰلُهُۥ فِي عَامَيۡنِ﴾ [لقمان: ١٤]

“আমি মানুষকে তার পিতা-মাতার ব্যাপারে নসিহত করছি। তার মা তাকে কষ্টের পর কষ্ট সহ্য করে তাকে নিজের পেটে বহন করেছে। আর তাকে দুধ ছাড়াতে দুই বছর লেগেছে।”[29]

---

[27] . আহমাদ মুল্লা জিওন, আত-তাফসিরাত আল- আহমাদিয়া, (পিশওয়ার: মাকতাবাহ হাক্কানীয়াহ, তা.বি) পৃ. ১৩৯।

[28] . আল-কুরআন, ৪৬:১৫।

[29] . আল-কুরআন, ৩১:১৪।

তিন: কুরআনের নির্ধারিত সময়সীমা তথা দুবছর পূর্ণ হওয়ার আগেও কেউ চাইলে দুধ ছাড়িয়ে নিতে পারবে, তবে এ শর্ত থাকবে যে, এতে স্বামী-স্ত্রী পারস্পারিক আলোচনার পর, দুধ ছাড়িয়ে নিলে দুগ্ধপায়ী শিশুর কোন ক্ষতি হবে না এ ব্যাপারে ঐক্যমত প্রতিষ্ঠিত হতে হবে। এ সম্পর্কে কুরআনের বিধান হচ্ছে:

﴿فَإِنۡ أَرَادَا فِصَالًا عَن تَرَاضٖ مِّنۡهُمَا وَتَشَاوُرٖ فَلَا جُنَاحَ عَلَيۡهِمَاۗ وَإِنۡ أَرَدتُّمۡ أَن تَسۡتَرۡضِعُوٓاْ أَوۡلَٰدَكُمۡ فَلَا جُنَاحَ عَلَيۡكُمۡ﴾ [البقرة:٢٣٣]

“যদি স্বামী-স্ত্রী উভয়েই পারস্পারিক পরামর্শ ও আলোচনার ভিত্তিতে দুধ ছাড়িয়ে নিতে চায়, তাহলে সেক্ষেত্রে তাদের কারো কোন গুণাহ হবে না।”[30] রাসূল (সা) শিশু অধিকারের কথা চিন্তা করে মাতৃদুগ্ধ পানকালে স্ত্রী সহবাস নিষিদ্ধ করতে চেয়েছিলেন। যেমন- এরশাদ হয়েছে:

«لقد هممت أن أنهى عن الغيلة حتى ذكرت ان الروم وفارس يصنعون ذلك فلايضر أولادهم.»

“দুগ্ধপায়ী শিশুর মায়ের সাথে স্বামীর সহবাস আমি নিষিদ্ধ ঘোষণা করতে চেয়েছিলাম; কিন্তু পারস্য ও রোমকদের সম্পর্কে

---

[30] . আল-কুরআন, ২:২৩৩।

আমাকে জানানো হল যে, তারা এ কাজ করে, তবে তাদের সন্তানদের কোন ক্ষতি হচ্ছে না।"[31]

চার. পিতার কর্তব্য হচ্ছে শিশুকে দুধ খাওয়ানো সময়ে দুগ্ধধাত্রী মাকে তাঁর শিশুর দুগ্ধপান সম্পর্কিত সমস্ত প্রয়োজনীয় বস্তু সরবরাহ করা। তবে তাতে স্বামী কর্তৃক স্ত্রীকে দেয় "ভরণপোষণ"[32] এ কোন প্রকার প্রভাব পড়বে না। এতে করে এ কথা প্রমাণিত হয় যে, শিশুকে প্রাকৃতিক পদ্ধতিতে দুগ্ধদান ও এমন এক ব্যাপার, যার পাশাপাশি মায়ের জন্যে অতিরিক্ত কোন দায়িত্বভার নেয়া সম্ভব নয়। কেননা পিতার বর্তমানেও মাকে শিশুর সার্বিক দেখাশুনার সার্বক্ষণিক দায়িত্বে নিয়োজিত থাকতে

---

[31] . মুসলিম ইবন আল-হাজ্জাল আল-কুশাইরী, সহীহ মুসলিম, খ. ১ কিতাবুল নিকাহ(দিল্লী: কুতুবখানা রশীদিয়া, তা.বি), পৃ. ৪৬৬; আবু দাউদ, কিতাবুল ত্বীব ৬১; তিরমিজি, কিতাবুল ত্বীন-১৭০।

[32] . "ভরণ পোষণ' কোন ব্যক্তির পরিশ্রমের বিনিময়ে তাকে অপর ব্যক্তি কর্তৃক প্রদত্ত প্রয়োজনীয় জীবনোপকরণকে "ভরণপোষণ" বলে। ভরণপোষণ দ্বারা সাধারণত খাদ্য, পোষাক ও বাসস্থান এই তিনটি জিনসিকে বুঝায়। কিন্তু অন্যান্য আবশ্যকীয় বস্তু যেমন তৈল, সাবান, ঔষধ যাহা নারীর জীবন ধারণ ও সুখ স্বাচ্ছন্দের জন্য জরুরী তাহাও ইহার মধ্যে অন্তভূক্ত। (কিতাবুল ফিক্হ আলাল মাযাহিবুল আরবাআহ, খ. ৪, পৃ. ৫৫৩)।

হয়। তাছাড়া পুত্র সন্তান বালেগ না হওয়া পর্যন্ত এবং কন্যা সন্তানের বিবাহ না হওয়া পর্যন্ত তাদের ভরণপোষণের দায়িত্ব পিতার উপর বর্তায়, তার সামর্থ্য অনুযায়ী।[33] পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছে:

﴿وَعَلَى ٱلْمَوْلُودِ لَهُۥ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِٱلْمَعْرُوفِۚ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَاۚ﴾ [البقرة: ٢٣٣]

"জনকের কর্তব্য যথারীতি তাদের (মাতাগণের) ভরণপোষণ করা। কাউকেও তার সাধ্যাতীত কার্যভার দেয়া হয় না।"[34] ইসলামে পরিবার পরিজনের ভরণপোষণের ব্যবস্থা করাকে সদকার সমতুল্য সাওয়াবের কাজ করা হয়েছে। যেমন হাদীস শরীফে এসেছে:

«اذا انفق المسلم نفقة على اهله وهو يحسبها كانة له صدقة.»

---

[33] . ইসলামী আইন বিধিবন্ধকরণ বোর্ড, বিধিবদ্ধ ইসলামী আইন(ঢাকা: ইফা. খৃ. ১৯৯৫), পৃ. ৬০১।

[34] . আল-কুরআন, ২:২৩৩।

“কোন মুসলিম ব্যক্তি সাওয়াবের আশায় তার পরিবার-পরিজনের জন্যে যা কিছু ব্যয় করে তা তার জন্য সদকা হিসেবে গণ্য হয়।”[35]

পাঁচ: ইসলাম পিতার অনুপস্থিতে বা মারা গেলে তার কোন একজন আত্মীয়কে শিশুর লালন-পালন এবং দুগ্ধধাত্রীর প্রয়োজনসমূহ ও সার্বিক দেখাশুনার দায়িত্ব প্রদান শিশু সন্তানের উদ্দেশ্যেই করেছে। ইসলাম এর মজবুত সীমারেখা নির্ধারণ করে দিয়েছে।

ছয়: মায়ের দুগ্ধদানের শক্তি ও সামর্থ্য থাকা অবস্থায় তাঁর পরিবর্তে অন্য কোন ধাত্রীর সাহায্যে শিশুকে স্তন্যদানের ব্যবস্থাকরণ এমন একটি বিষয়, যা ইসলাম আদৌ উৎসাহিত করেনি। অনুরূপভাবে দুগ্ধদানের বিনিময়ে ইসলাম বৈষয়িক আকর্ষণও সৃষ্টি করেছে, যেমন স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে সম্পর্কচ্ছেদ ঘটলে

---

[35] . সহীহ বুখারী, কিতাবুয যাকাত, বাবু ফাদলিন নাফাকাতি আলাল আহলি, সহীহ্ মুসলিম, কিতাবুয যাকাত, হাদীস নং ৪৮।

সে ক্ষেত্রে প্রয়োজনে দুগ্ধধাত্রী মাকে স্তন্যদানের বিনিময় প্রদানের বিধান রেখেছে।[36] এ ব্যবস্থার পেছনে কারণ হচ্ছে এই যে, যাতে করে মহিলা শিশুর ব্যাপারকে তুচ্ছ বা হেয় করে না দেখে।

মাতৃদুগ্ধ শিশুর প্রথম খাবার

নবজাতকের জন্মের পর তার উপযোগী প্রথম খাবার হল মায়ের বুকের শালদুধ। যা মায়ের গর্ভকালীন সময়ে ৬/৭ মাস থেকে আল্লাহ তা'আলা তার রহমত স্বরূপ শিশুর প্রয়েঅজন ও চাহিদা অনুযায়ী মায়ের স্তনে সৃষ্টি করে দেন। স্বল্প পরিমাণের হলুদাভ এ তরল দুগ্ধটুকুই শিশুর প্রথম জীবনের চাহিদা মেটাতে যথেষ্ট। শালদুধকে আল্লাহ তাআলা মায়ের স্বাভাবিক দুধের চেয়ে অধিক আমিষ এবং ভিটামিন 'এ' দিয়ে নবজাতকের প্রথম সঠিক ও সুষম খাদ্য হিসেবে সৃষ্টি করে থাকেন। জন্মের পর খাদ্য হিসেবে শিশুর যা যা দরকার তার সকল উপাদান শালদুধে বিদ্যমান। শালদুধের পর যে দুধ বুকে আসে তার তুলনায় শালদুধে অনেক রোগ প্রতিরোধক উপাদান ও শ্বেতকণিকা থাকে

36

যা শিশুকে বিভিন্ন রোগজীবাণু হতে রক্ষা করে। সুতরাং শালদুধ হচ্ছে শিশুর প্রথম টিকা।[37] শালদুধে যে সব উপাদান থাকে তা শিশুর কচি ও অপরিণত পেট এবং অন্ত্রকে পরিপক্ক হতে সাহায্য করে। এ সব গ্রোথ ফ্যাক্টর শিশুর অন্ত্রণালীকে দুধ হজম করতে সাহায্য করে। এছাড়া যে সব আমিষ জাতীয় বস্তু শরীরে প্রবেশ করলে ক্ষতি হওয়ার সম্ভাবনা থাকে পেট থেকে শরীরের ভেতর ঢুকতে এই 'গ্রোথ ফ্যাক্টর' বাধা প্রদান করে। সেহেতু শালদুধ দেয়ার আগে অন্য কোন খাবার যেমন মধু, পানি, মিছরীর শরবত, গরুর দুধ ইত্যাদি দেয়ার কোন প্রয়োজন নেই। উল্লেখিত খাবার দেয়া হলে শিশুর অন্ত্র ঠিকমতো পরিপক্ক হয় না, বরং ক্ষতিগ্রস্থ হওয়ার আশংকা থাকে এবং এর ফলে প্রায়ই তার এলার্জি হতে দেখা যায়। শালদুধ একটি রেচকের মত কাজ করে শিশুর পেটের প্রথম কালো পায়খানা বা মিকোনিয়াম বের করে দিতে সাহায্য করে। মিকোনিয়াম বেশিক্ষণ পেটে থাকলে শিশুর জন্ডিস হওয়ার আশংকা থাকে। শিশু জন্মের এক থেকে দু সপ্তাহ ধরে মায়ের বুকের দুধের পরিমাণ বাড়তে থাকে, সঙ্গে সঙ্গে উপদানের মধ্যেও

---

[37] . Dr. F. Savage King Helping Mothers to Breastfeed, অনু. শামীম আহমেদ (ঢাকা: ১৯৯৪), পৃ. ১৫।

পরিবর্তন ঘটে। অর্থাৎ শালদুধ কয়েক দিনের মধ্যে পূর্ণতাপ্রাপ্ত দুধ হয়ে যায়। দেখতে গরুর দুধের চেয়ে পাতলা বলে অনেক মা এ দুধের কার্যকারিতা নিয়ে চিন্তায় পড়ে যায়। অথচ শিশুর বেড়ে উঠার জন্যে এবং তার শারীরিক ও মানসিক ক্রমবিকাশের ক্ষেত্রে যে সব উপাদান প্রয়োজন, তা তার চাহিদা অনুযায়ী বুকের দুধে সংমিশ্রণ ঘটতে থাকে। কেননা, শিশু জন্মের পর এক দিনেই বেড়ে ওঠে না, বরং ক্রমান্বয়ে সে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। যেমন আল-কুরআনে এসেছে:

"যিনি তোমাকে সৃষ্টি করেছেন, অত:পর তোমাকে সুঠাম করেছেন এবং সুসামঞ্জস্য করেছেন।[38] তার বেড়ে উঠার গতির সাথে সামঞ্জস্য রেখেই আল্লাহ তা'আলা মায়ের দুধের উপাদান পরিবর্তন করে থাকেন। এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে শিশু বেড়ে উঠার জন্য যে পরিমাণ পানি আছে বলে তাকে আলাদা করে পানি দেবার কোন প্রয়োজন নেই।"[39]

---

[38] . আল-কুরআন, ৮২:৭।

[39] . Dr. F. Savage, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৬।

শিশুর আদর্শ খাবার

'মায়ের দুধের বিকল্প নেই'-এ কথাটি সর্বজনবিদিত। চিকিৎসা বিজ্ঞান বহু গবেষণার পর এ সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছে যে, শিশুর জন্য মায়ের দুধই সর্বোত্তম ও নিরাপদ খাবার। মায়ের দুধে রয়েছে এমন সব উপাদান যা কোন ধরনের সংক্রমণ থেকে শিশুকে রক্ষা করতে পারে। পর্যাপ্ত পরিমাণ পুষ্টি ছাড়াও মায়ের দুধ শিশুর সুস্থ মানসিক বিকাশে সাহায্য করে। পাঁচ মাস বয়স পুরা হওয়া পর্যন্ত শিশুর জন্য যা প্রয়োজন তার সবই মায়ের দুধে আছে। শিশু খুব তাড়াতাড়ি ও সহজেই বুকের দুধ হজম করতে পারে। কেননা মায়ের দুধে আছে:

ক) শিশুর জন্য সঠিক পরিমাণে এবং সবচাইতে উপযোগী আমিষ ও চর্বি।

খ) অন্যান্য দুধের চাইতে বেশী পরিমাণ ল্যাকটোজ বা শর্করা যা শিশুর প্রয়োজন।

গ) যথেষ্ঠ পরিমাণে ভিটামিন বা খাদ্য প্রাণ। তাই মায়ের দুগ্ধ পান ক রা নো হলে শিশুকে আলাদাভাবে কোন ভিটামিন দিতে হয় না।

ঘ) শিশুর জন্য প্রয়োজন যথেষ্ঠ লৌহ (আয়রন)। এর প্রায় সবটাই সহজে হজম হয় বলে বুকের দুধ পান করলে শিশু রক্ত শূন্যতায় ভোগে না।

ঙ) প্রচুর পরিমাণে পানি, যে কারণে গরম কালেও শিশুকে আলাদা পানি দিতে হয় না।

চ) যথেষ্ঠ পরিমাণে লবণ ও খনিজ পদার্থ।

ছ) এক ধরনের এনজাইম, যা চর্বি হজম করতে সাহায্য করে।

আল্লাহ তাআলা শিশুর শরীরের চাহিদা অনুযায়ী মায়ের স্তনে সুপরিমিত উপাদান সহকারে দুধ সৃষ্টি করতে থাকেন। এমনকি শিশু যে বয়সে যে পরিমাণ তাপমাত্রা সহ্য করতে পারে, আল্লাহর ইচ্ছায় সেই পরিমাণ তাপ মাত্রায় দুধ তৈরী হয়ে থাকে।[40]

---

[40]. মুহাম্মাদ শফিকুর রহমান, ইসলাম ও মায়ের দুধ, প্রজন্ম, ১৫ শ বর্ষ, ৩য় সংখ্যা, (ডিসেম্বর-১৯৯৫), পৃ. ৭।

সংক্রামক রোগ প্রতিরোধক

শুধুমাত্র মায়ের দুধেই রয়েছে শিশুর যাবতীয় রোগ প্রতিরোধ করার মত উপাদান। মায়ের দুধ পান করে বড় হলে বেশি বয়সেও সন্তান বহুবিধ রোগের হাত থেকে রক্ষা পেতে পারে। মায়ের দুধ সকল সংক্রামক রোগ থেকে শিশুকে রক্ষা করে। বুকের দুধে কোন রোগ জীবাণু নেই বলে এ দুধ পান করে শিশু কোন সময় অসুস্থ হয় না। এতে আছে রোগ প্রতিরোধক বহু উপদান যা শিশুকে অসুখ-বিসুখ থেকে রক্ষা করে। এ উপাদানগুলোর মধ্যে আছে:

1. জীবাণু ধ্বংসকারী জীবিত শ্বেতকণিকা (লিউকোসাইটিস)।

2. রোগ প্রতিরোধক ইম্মিউনোগ্লোবিউলিন বা এন্ডিবডি। শিশুর শরীরে রোগ প্রতিরোধক ক্ষমতা গড়ে না উঠা পর্যন্ত এসব এন্টিবডি শিশুকে ননারকম রোগ থেকে রক্ষা করে।

3. 'বাইফিভাস ফ্যাক্টর' নামে একটি পদার্থ যা শিশুর পেটে বিশেষ একটি জীবাণু যা ব্যাক্টরিয়াকে বাড়তে সাহায্য করে। এই জীবাণু হচ্ছে 'ল্যাক্টোবেসিলস' যা পেটে অন্যান্য ক্ষতি কারক

জীবাণুকে ধ্বংস করে শিশুকে ডায়রিয়ার হাত থেকে রক্ষা করে।[41] মোটকথা মায়ের দুধ সব সময় শিশুকে অসুস্থতার হাত থেকে রক্ষা করে। দু'তিন বছর বয়সেও অসুস্থ হলে বুকের দুধ থেকে পাওয় ক্ষমতা শিশুকে সারিয়ে তুলতে সাহায্য করে। ফলে মায়ের দুধ শিশু মৃত্যুার হার কমায়।[42] সম্প্রতি কালের বহু গবেষণায় দেখা গেছে শিশুকে মায়ের দুধ পান করালে শিশু মৃত্যুর হার শতকরা ৩ ভাগ কমে যায়।[43]

ক্যান্সার প্রতিরোধক

মাতৃদুগ্ধ পুষ্টিকরই শুধু নয়, এতে রয়েছে জীবাণু প্রতিরোধক উপাদান (এন্টিবডি) সমূহ যা ভাইরাসের বিরুদ্ধে লড়াই করে। মায়ের দুধে আরো রয়েছে রোগ সৃষ্টিকারী ব্যাকটেরিয়া নির্মূলকারী প্রটোজোয়াণ এনজাইম ও ফপটি এডিস যা ফুসফুস ও পাকস্থলীর কোষে হামলা চালাতে জীবাণুকে বাধা

---

41 . Dr. F. Savage, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪।

42 . মুহাম্মাদ শফিকুর রহমান, ইসলাম ও পারিবাকি জীবন, (ঢাকা: আই.ই. এম. ইউনিট, খৃ. ১৯৯৫), পৃ. ৫১।

43 . প্রফেসর ডা. শাহলা খাতুন, দৈনিক ইত্তেফাক, ১৩ জুলাই, ২০০১, পক্. ৩।

দেয়ার মাধ্যমে সংক্রমণ প্রতিরোধে সাহায্য করে। বর্তমান চিকিৎসা বিজ্ঞানীগণ আবিস্কার করেছেন যে, মায়ের দুধ ক্যান্সারও প্রতিরোধ করে। সম্প্রতি সুইডিনের 'লাভ' বিশ্ববিদ্যালয়ের চিকিৎসাবিদ্যা গবেষক আনডার্স হাকামসন মায়ের দুধে যে ক্যান্সার জীবাণুকে প্রতিরোধ করে তা সফলভাবে পরীক্ষা করে প্রমাণ করেছেন।[44]

মানসিক বিকাশে সহায়তা

মায়ের দুধ শিশুর সঠিক শারীরিক ও মানসিক বিকাশে অনন্য ভূমিকা পালন করে। পৃথিবীতে যত প্রকার খাবার আছে তন্মধ্যে মায়ের দুধই শিশুর জন্য সর্বোত্তম খাবার, আর এটিই শিশুর জন্য নিরাপ,দ ও সুষম খাবার। সম্প্রতি বাংলাদেশ ব্রেস্ট ফিডিং ফাউন্ডেশন এর স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ের যৌথ উদ্যোগে অনুষ্ঠিত এক মিডিয়া ওয়ার্কশপে বিভিন্ন গবেষণামুলক প্রতিবেদনের ভিত্তিতে অভিমত ব্যক্ত করা হয় যে,

[44] . দৈনিক ইনকিলাব, ১৭ সেপ্টেম্বর, ১৯৯৫।

দু'বছর পর্যন্ত মায়ের দুধ খেলে শিশুর আইকিউ বা বুদ্ধিমত্তা শতকরা ১০ ভাগ বেশি হয়।[45]

তদুপরি দুগ্ধদানের কারণে মায়ের হজম শক্তি উন্নত হয়, তার মধ্যে সৃষ্টি করে সাধারণ স্বাস্থ্যোন্নতি এবং শিশুর প্রয়োজনীয় খাদ্য প্রাণ আহরণের নিমিত্তে বিশেষ পদক্ষেপ গ্রহণের আগ্রহ ও অনুপ্রেরণা। তাছাড়া স্তন্যদান তাঁর গর্ভধারণ প্রক্রিয়াকে স্বাভাবিক রাখতে এবং জন্মজনিত কারণে ক্ষয়প্রাপ্ত শক্তিকে ফিরে পেতে সাহায্য করে। বতর্মানে প্রাকৃতিক পদ্ধতিতে দুগ্ধদানে শৈথিল্য প্রদর্শনের অশুভ পরিণতি সম্পর্কে সতর্ক করে দিচ্ছে। রাসূল (সা.) আরবের রীতি অনুযায়ী ধাত্রী দ্বারা দুধ খাওয়ানোর ব্যাপারে দুশ্চরিত্রা মহিলাকে ধাত্রী নিয়োগের ক্ষেত্রে সতর্কতা অবলম্বনের প্রতি নির্দেশ দিয়েছেন। কেননা দুধের প্রভাব পরস্পরের মধ্যে সম্প্রসারণযোগ্য। তিনি বলেছেন: তোমরা তোমাদের সন্তানদেরকে দুশ্চরিত্রা ও অপ্রকৃতস্থ রমণীর দুগ্ধপান করানো ব্যাপারে সতর্কতা অবলম্বন কর।[46]

---

[45] . দৈনিক ইত্তেফাক, ২৩ জুলাই, ২০০১।

[46] . ইসলামে শিশু পরিচর্যা, পৃ. ৪১।

পারিবারিক আয়ের সহায়ক

শিশুকে গরুর দুধ অথবা টিনজাত দুধ না পান করিয়ে মায়ের দুধ পান করালে অর্থের অনেক সাশ্রয় হয়। চিকিৎসা বিজ্ঞানের মতে একটি শিশুর প্রতি কেজি ওজনের জন্য প্রতিদিন গড়ে ১৫০ মিলি লিটার দুধ প্রয়োজন হয়।[47] সে হিসেবে ৭ কেজি ওজনের একটি শিশুর জন্য একদিনে প্রয়োজন হয় ১ লিটার (১০০০ মি.লি) দুধ। শিশু স্বাভাবিকভাবে বেড়ে উঠার জন্য ৫ মাসে প্রয়োজন হবে (৩০দ্ধ৫দ্ধ১) ১৫০ লিটার দুধ। বর্তমান প্রতি লিটার গরুর দুধের দাম ৪০ টাকা হলে প্রয়োজন (১৫০দ্ধ৪০) = ৬০০০ টাকা। আবার যদি কৌটা বা টিনজাত দুধ পান করানো হয় তাহলে ৫ মাসে শিশুর জন্য বর্তমান বাজার দরে প্রয়োজন হয় প্রতি কেজি ৫২ টাকা হিসেবে (৫২দ্ধ১৫০) = ৭৮০০.০০ টাকা।

অথচ মা যদি শিশুকে বুকের দুধ পান করান, তাহলে তাকে প্রতিদিনের খাবারের সাথে সামান্য পরিমাণ বাড়তি খাবার খেলেই শিশুর জন্য পর্যাপ্ত দুধ তৈরি হয়। একজন মা রোজ যা খান তার সাথে দুমুঠো বেশি ভাত ও দুচামচ ডাল (৫.০০) টাকা, একটু তৈল ও এক মুঠো শাক-সবজি (৩.০০) টাকা খেলে

---

[47] . Dr. F. Savage, প্রাগুক্ত।

সারাদিন হয়তো সাত থেকে আট টাকা বেশি লাগে। তাহলে ৫ মাসে খচর হবে ৭২০.০০ টাকা। তাছাড়া গরুর দুধ বা টিনজাত দুধ তৈরি করার পর নষ্ট হয়ে যায়। কিন্তু মায়ের দুধ কোন অবস্থাতেই নষ্ট হয় না। সুতরাং নির্দ্ধিধায় বলা যায় যে, শিশুকে মাতৃদুগ্ধ পান করালে পরিবারের আর্থিক ব্যয় কমে।

বিলম্বিত গর্ভধারণের সহায়ক

শিশু মাতৃস্তন্য পানকালে সাধারণত মায়ের পুনরায় গর্ভসঞ্চারের সম্ভাবনা কম থাকে। শিশুকে স্তন্যদান একটি প্রাকৃতিক গর্ভনিরোধ প্রক্রিয়া।[48] শিশু যদি ঘন ঘন এবং রাতেও দুধ পান করে তাহলে প্রল্যাকটিন ও অন্যান্য হরমোন যথেষ্ট পরিমাণে তৈরি হয়ে গর্ভধারণের সম্ভাবনা কমিয়ে দেয়। ফলে বুকের দুধ পান করালে দুসন্তানের জন্মের মাঝে ব্যবধান সৃষ্টি হয়।[49] মা যখন শিশুকে স্তনের দুধ পান করান তখন মাকে উপযুক্ত বাড়তি খাবার খেতে দিলে স্বাভাবিকভাবে মায়ের স্তনে দুধ

---

[48] . আবদেল রহীম উমরান, ইসলামী ঐতিহ্য পরিবার পরিকল্পনা, (অনু. শামছুল আলম, ঢাকা-১৯৯৫), পৃ. ১৩২।

[49] . ডাঃ ফিলিসিটি স্যাভেজ, বুকের দুধ খাওয়াতে মায়েদের সাহায্য করা, (অনু. শামীম আহমেদ, ঢাকা: খৃ. ১৯৯৪), পৃ. ১১৪।

বেড়ে যায়। এটা সন্তানের জন্য আল্লাহ তা'আলার নিয়ামত স্বরূপ। এ নিয়ামত যাতে সন্তান পুরোপুরি ভোগ করতে পারেন সেজন্য আল ।লাহই সন্তানের দুধপানকালে মায়ের গর্ভে দ্বিতীয় সন্তান দেন না।[50] বাংলাদেশের প্রখ্যাত শিশু বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক অধ্যাপক এম.কিউ. কে তালুকদারের মতে, শিশুকে প্রথম পাঁচ মাস শুধুমাত্র বুকের দুধ পান করালে এবং সে সময় মায়ের মাসিক না হলে গর্ভবতী হওয়ার সম্ভাবনা শতকরা ২ ভাগেরও কম থাকে। তার মতে, যে সমাজে কৃত্রিম জন্মনিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি প্রচলন কম, সেখানে শিশুকে মাতৃদুগ্ধ দান একটি স্বাভাবিক জন্মনিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি হিসেবে বেশ কার্যকর।[51] বুকের দুধ পান করানোর মাধ্যমে সাময়িক জন্মবিরতি পদ্ধতিকে ইংরেজিতে 'ল্যাম' পদ্ধতি বলে। এ পদ্ধতিতে সুফল লাভের জন্য নিম্নের নিয়মগুলো মেনে চলা আবশ্যক।[52]

1) পাঁচ মাস বয়স পুরো না হওয়া পর্যন্ত শিশুকে বুকে দুধ পান করাতে হবে।

---

50 . মুহাম্মাদ শফিকুর রহমান, ইসলাম ও পারিবারিক জীবন, (ঢাকা: আই.ই.এম. ইউনিট, খৃ. ১৯৯৫), পৃ. ৫২।

51 . আপনার স্বাস্থ্য, তথ্য বহুল স্বাস্থ্য সাময়িকী, সেপ্টেম্ব-৯৫, সংখ্যা।

52 . ডাঃ ফিলিসিটি স্যাভেজ, বুকের দুধ খাওয়াতে মায়েদের সাহায্য করা, (অনু. শামীম আহমেদ, ঢাকা: খৃ. ১৯৯৪), পৃ. ১১৫।

2) শিশুকে ঘনঘন দুধ পান করাতে হবে। দু'বার পান করার মাঝে দীর্ঘ বিরতী দেয়া যাবে না।

3) দিনে বা রাতে শিশু যখনই দুধ চাইবে তখনই তাকে বুকের দুধ পান করাতে হবে।

4) দু'বার দুধ পান করানোর মাঝে বিরতী যেন কোন অবস্থাতেই ছয় ঘন্টার বেশী না হয়।

সতন্ত্র শয্যায় নিদ্রা যাবার অধিকার

প্রত্যেক শিশুরই পৃথক এবং একক শয্যায় নিদ্রা যাবার অধিকার আছে। রাসূল (সা.) বলেন-

«مُرُوا أَوْلاَدَكُمْ بِالصَّلاَةِ وَهُمْ أَبْنَاءُ سَبْعِ سِنِينَ وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا وَهُمْ أَبْنَاءُ عَشْرِ سِنِينَ وَفَرِّقُوا بَيْنَهُمْ فِي الْمَضَاجِعِ»

সাত বছর বয়সে শিশুকে নামায পড়ার নির্দেশ দাও, দশ বছর হয়ে গেলে নামায না পড়লে তাদেরকে শাস্তি দাও এবং তাদের জন্য পৃথক শয্যার ব্যবস্থা কর।[53] পৃথক শয্যার ব্যবস্থা

[53] . সুনানু আবি দাউদ, পৃ. ৬৭৬।

পৃথক পৃথক কক্ষে হতে পারে, একই কক্ষে বিভিন্ন জায়গায় হতে পারে। তবে প্রত্যেকের জন্য শয্যা আলাদা হতে হবে।[54]

ভবিষ্যৎ আর্থিক নিরাপত্তা

পিতা-মাতার অবর্তমানে সন্তান যাতে অর্থনৈতিক সমস্যার না পড়ে সে দিকে পিতা-মাতার সচেতন থাকতে হবে। পিতা-মাতা কিংবা শিশুর দায়িত্ব গ্রহণকারী অন্যান্যদের প্রাথমিক দায়িত্ব হচ্ছে, সামর্থ্য ও আর্থিক সংগতি অনুযায়ী শিশুর উন্নয়নের জন্য উপযোগী জীবনমান নিশ্চিত করা।[55] যেমন রাসূল (সা) বলেছেন:

«لأن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس»

---

[54] . ইসলামী ঐতিহ্য পরিবার পরিকল্পনা, পৃ. ৫৪।

[55] . Action Research Study. Institutional Development of Human Rights in Bangladesh. (IDHRB) Ministry of law justice and parlimentary Affairs. Goverment of Bangladesh, December-2000. International Convention on the Right of the child , p. 31.

নিজের সন্তানকে অন্যের দায়-দাক্ষিণের উপর ফেলে যাবার চেয়ে অভাবমুক্ত রেখে যাওয়া উত্তম।[56]

আল্লাহ তা'আলা এ প্রসঙ্গে এরশাদ করেন:

﴿وَلۡيَخۡشَ ٱلَّذِينَ لَوۡ تَرَكُواْ مِنۡ خَلۡفِهِمۡ ذُرِّيَّةً ضِعَٰفًا خَافُواْ عَلَيۡهِمۡ﴾ [النساء:٩]

"তাদের ভয় করা উচিত তারা যদি অসহায় সন্তান রেখে দুনিয়া থেকে চলে যায় তবে মৃত্যুর সময় সন্তানদের সম্পর্কে তাকে আশংকা ও উদ্বিগ্ন করবে।[57]

শিক্ষা, প্রশিক্ষণ ও আদর্শবান হিসেবে গড়ে উঠার অধিকার

সন্তানকে শিক্ষা প্রদানের দায়িত্ব পিতা-মাতার। তাদেরকে লিখতে এবং পড়তে শিক্ষা দেয়ার জন্য সবচেয়ে বেশী দায়ী করা যায় পিতা-মাতাকে। এক্ষেত্রে লিখা পড়া শিক্ষা দেবার সাথে সাথে পারিবারিক, বৈষয়িক এবং আদর্শিক শিক্ষা প্রদান করতে হবে। রাসূল (সা.) পিতা-মাতাকে নির্দেশ দিয়েছেন সন্তানকে লেখাপড়া,

---

[56] সহীহ বুখারী, কিতাবুয জানায়েয, হাদীস নং-২; মাগাযী, হাদীস নং ৬৪; ইবন মাজাহ, হাদীস নং ৫।

[57] আল-কুরআন, ৪:৯।

ধর্মীয় মূল্যবোধ প্রতিষ্ঠা এবং খেলাধুলা বিষয়ে শিক্ষা দেবার জন্য। যেমন হাদীস শরীফে এসেছে:

“আবু রাফের মুনির আবু সালমান হতে বর্ণিত, রাসূল (সা) এরশাদ করেন, পিতা-মাতার উপর সন্তানের যেমন অধিকার রয়েছে তেমনি সন্তানের নিকটও পিতা-মাতার প্রাপ্য অধিকার রয়েছে। পিতা-মাতা হতে সন্তানের অধিকার হলো লিখতে শিক্ষা দেবে, সাঁতার শিক্ষা দেবে এবং তীবন্দাজী শিক্ষা দেবে। তাদের এমন কিছু শিক্ষা দেবে না, যা সন্তানকে ন্যায়নিষ্ঠা করে না।”[58] রাসূল (সা.) আরো এরশাদ করেন:

“শিশুদের স্নেহ কর এবং তাদের প্রতি দয়া প্রদর্শন কর। তোমরা তাদের সাথে কোন ওয়াদা করলে তা পূরণ কর। কেননা তাদের দৃষ্টিতে তোমরাই তাদের রিযিকের ব্যবস্থা করছ।”[59]

অন্যত্র হাদীস শরীফে এসেছে: الزموا أولآدكم “তোমরা তোমাদের সন্তানদের প্রতি সর্বদা দৃষ্টি রাখ।”[60]

---

[58] ইসলামী ঐতিহ্য পরিবার পরিকল্পনা, পৃ. ৫৪; শিশু পরিচর্যা, পৃ. ৫৬।

[59] . ইসলামে শিশু পরিচর্যা, পৃ. ৪।

[60] . প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৭।

অন্যত্র হাদীস শরীফে এসেছে: “তোমরা নিজেদের সন্তানদের স্নেহ কর এবং তাদের ভাল ব্যবহার শেখাও।”[61]

«لأن يؤدب الر جل ولده خير من أن يتصدق بصاع»

“ব্যক্তির সন্তানকে সদাচার শিক্ষা দেয়া এক সা দান খয়রাতের চেয়েও উত্তম।”[62]

«علموا اولادكم فإنهم مخلوقون لزمان غير زمانكم»

“তোমরা সন্তানদের জ্ঞান দান কর। কেননা তারা তোমাদের পরবর্তী যুগের সৃষ্ট।”[63]

সন্তানের প্রতি পিতার দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কে রাসূল (সা) আরো বলেন:

---

61 . আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মাদ ইবন ইয়াযিদ ইবন আব্দুল্লাহ ইবন মাজাহ, সুনানু ইবনু মাজাহ, কিতাবুল আদাব, (দিল্লী: কুতুবখানা রশীদিয়া, তা.বি), হাদীস নং ৩, পৃ. ২৬৯।

62 . আবু ঈসা মুহাম্মাদ ইবন ঈসা, জামে তিরমিজি (দিল্লী: কুতুবখানা রশীদিয়া, তা.বি), হাদীস নং ১৯৫৭।

63 . ইসলামে শিশু পরিচর্যা, পৃ. ৭৮।

«من له ولد فليحسن اسمه وأدبه فإذا بلغ فليزوجه فإن بلغ ولم يز وجه فاصاب إثما فإنما إثمة على أبيه»

"কারো সন্তান জন্ম গ্রহণ করলে তার কর্তব্য সে যেন সুন্দর নাম রাখে এবং উত্তম আদব শিক্ষা দেয়| যখন সে বয়:প্রাপ্ত হবে তখন তার বিবাহ দিবে। যদি সে বয়:প্রাপ্ত হয় আর পিতা যদি বিবাহ না দেয় তখন সন্তান কোন গুনাহের কাজ করলে সে গুনাহ তার পিতার হবে।"[64]

মতামত প্রদানের অধিকার

শিশুর মতামত একেবারে নিম্নমানের সাদাবিধে বা মূল সমস্যা থেকে বহু দূরেই হোক না কেন; বিভিন্ন সমস্যার সময় তাদের মতামত গ্রহণ করা। তার মতামতকে তুচ্ছ জ্ঞান করা তাকে হেয় প্রতিপন্ন করা উচিত নয়, বরং তাতে কোন ভুল ভ্রান্তি থাকলে তা দেখিয়ে দেয়া ও সঠিক মতকে তার সামনে প্রকাশ করা। পিতা-মাতার এভাবে শিশুকে মতামত প্রদানের সুযোগদান

[64] . সম্পাদনা পরিষদ, ইসলামিয়াত, সংস্ক. ৯ (ঢাকা: কোরআন মহল, খৃ. ১৯৯০), পৃ. ৭৫।

শিশুকে সঠিক পথে পরিচালিত করে এবং তাকে যথাযথ দিক-নির্দেশনা দানে সহায়তা করে। এ ক্ষেত্রে নিম্নবর্ণিত পন্থাসমূহ অবলম্বন করা যেতে পারে।

1. বিভিন্ন সমস্যার সমাধানে মতামত ব্যক্ত করতে তাকে অভ্যস্ত করানো এবং সমস্যা সম্পর্কে তার মধ্যে চেতনা সৃষ্টি করা।

2. তার মতামতে কোন ভুল-ভ্রান্তি থাকলে তা দেখিয়ে দিয়ে সুন্দর মতামত দান ও সিদ্ধান্ত গ্রহণে তাকে সাহায্য করা।

3. বড়দের মন্তব্য প্রকাশ ও তাদের মন্তব্য এবং মতামতের ভাল দিকগুলো দেখিয়ে দেয়া, যাতে শিশুর অন্তরেও সঠিক মতামত পেশ ও সিদ্ধান্ত গ্রহণের শক্তি সৃষ্টিতে চিন্তা করার অবকাশ জন্মে।

4. সমস্যাদি সম্পর্কে শান্ত পর্যালোচনায় অভ্যস্ত করানো। যাতে করে কোন সমস্যা দৃষ্টে সে অক্ষমের মত দাঁড়িয়ে না থাকে; বরং এর সমাধানে তার মধ্যে সৃষ্টি হয় একটি মনোবল।

বিভিন্ন মতামত ও সিদ্ধান্তের ভাল ও মন্দ উভয় দিক নিয়ে তার সাথে আলোচনা করা উচিত।

5. এভাবে শিশুদেরকে ভবিষ্যতের জন্যে এবং আগামী দিনে যে সমস্ত সমস্যাদির সম্মুখীন হবে তার সুন্দর মুকাবিলার জন্য তাদেরকে যোগ্য করে গড়ে তুলা যেতে পারে।

6. তাকে একজন মূল্যহীন মন্তব্যকারী হওয়ার মনোভাব পোষণ না করে বিভিন্ন সমস্যাদির মুকাবিলায় অভ্যস্ত করানো দরকার, যাতে কোন সমস্যাদৃষ্টে সে ভীত-সন্ত্রস্ত কিংকর্তব্য বিমুঢ় হয়ে না পড়ে। ইসলাম এ বিষয়টিকে উৎসাহিত করেছে। তার একটি উদাহরণ হচ্ছে হযরত আব্দুল্লাহ ইবন উমর (রা.) এর ঘটনা। একবার রাসূল (সা) জিজ্ঞেস করলেন, আল্লাহ মুমিনদেরকে একটি বৃক্ষের সাৃথে তুলনা করেছেন যার পাতা ঝরে না, তোমাদের জানা আছে কি, তা কোন বৃক্ষ? সাহাবীগণ সবাই চুপ থাকলেন। তখন রাসূল (সা) নিজেই উত্তর দিলেন; তা হচ্ছে খেজুর গাছ।'' আব্দুল্লাহ ইবন উমার তার পিতার সাথে সেখানে উপস্থিত ছিলেন। পিতা- পুত্র উভয়ই যখন বাড়ীতে ফিরে গেলেন; তখন আব্দুল্লাহ ইবন উমার তার পিতাকে বললেন, রাসূল (সা) যা বলেছিলেন তা আমার জানা ছিল কিন্তু সাহাবীদের সামনে

উত্তর দিতে ভয় করেছিলেন। তখন তার পিতা তাকে বললেন, তুমি যদি উত্তর দিতে তাহলে আমার নিকট অধিকতর আনন্দের বিষয় হতো।[65]

সমব্যবহারের অধিকার

সন্তান হিসেবে ছেলে মেয়ে উভয় সমব্যবহারের অধিকারী, এ ক্ষেত্রে কোন প্রকার ব্যবধান সৃষ্টি করা যাবে না। রাসূল (সা) এ ব্যাপারে এরশাদ করেছেন:

«اتقوا الله وإعدلوا فى أولادكم»

তোমরা আল্লাহ তাআলাকে ভয় কর এবং সন্তানদের ব্যাপারে ইনসাফ কায়েম কর।[66] মেয়েদের প্রতি অবহেলা করে ছেলেদেরকে অধিকতর গুরুত্বদান ইসলামে নিষিদ্ধ। সকল সন্তানের প্রতি সমব্যবহার করা পিতা-মাতার উপর অবশ্য কর্তব্য। হাদীসে বর্ণিত নিম্নোক্ত ঘটনা দ্বারা এ বিষয়টি প্রমাণিত হয়।

---

[65]. ইসলামে শিশু পরিচর্যা, পৃ. ৫০-৫১।

[66] . সহীত মুসলিম, কিতাবুল হিবাহ, খ. ২, পৃ. ২৭।

«وعن أنس : كان رجل عند النبي (ص) فجاء إبن له فقبله وأجلسه على فخذه وجاءت بنت له فأ جلسه بين يديه فقال الرسول (ص) : ألا سويت بينهما؟»

'আনাস ইবন মালেক (রা) বর্ণনা করেছেন যে, এক ব্যক্তি রাসূল (সা) এর নিকট উপবিষ্ট ছিলেন। তার শিশু পুত্র তার নিকট এল। উক্ত সাহাবী তাকে চুম্বন করলেন এবং কোলে বসালেন। একটু পরে তার কন্যা এলো। তাকে তিনি তার সামনে বসালেন। তখন রাসুল (সা.) সাহাবীকে বললেন তোমার কি উচিত ছিল না দুজনের প্রতি সমআচরণ করা?[67] জাগতিক স্বার্থের মোহে, অর্থনৈতিক ও সামাজিক কারণে মানুষ সাধারণত: পুত্র সন্তান হলে আনন্দিত হয়, কন্যা সন্তান হলে অসুন্তুষ্ট হয়। ইসলাম এ হীন ও সংকীর্ণ মনোভাব দূর করতে উপদেশ দিয়েছে। বরং পুত্র সন্তানের তুলনায় কন্যা সন্তানকে পরকালের মুক্তির অন্যতম উপায় হিসেবে ঘোষনা করেছেন। কেননা কন্যা সন্তানকে লালন-পালন করায়, তাকে সৎ ও সুশিক্ষা দেয়ায়, বয়:প্রাপ্ত হলে সৎ পাত্রে পাত্রস্থ করায় এবং পরবর্তীকালে তার খোঁজ খবর নেয়া ও দেখাশুনা করায় পিতার জাগতিক কোন স্বার্থ থাকে না। উপরন্তু অনেক

[67] . ইসলামে শিশু পরিচর্যা, পৃ. ৫৬।

ত্যাগ স্বীকার করতে হয়। এ ব্যাপারে উৎসাহিত করে রাসূল (সা) বলেছেন:

«من كانت له أنثى فلم يئدها ولم يهنها ولم يؤثر ولده عليها قال يعني الذكور أدخله الله الجنة»

"যাহার কন্যা সন্তান হয়েছে, অথচ উহাকে জীবন্ত কবর দেয় নাই, তাকে লাঞ্ছিত করে না কিংবা তার তুলনায় পুত্র সন্তানকে বেশী স্নেহ করে নাই, আল্লাহ তা'আলা তাকে জান্নাতের প্রবেশ করাবেন।[68] এমনকি বিধবা কিংবা তালাকপ্রাপ্ত কন্যার যদি দেখা-শুনা বা নিরাপত্তা বিধান করার কেউ না থাকে এবং পিতার গৃহে অসহায় অবস্থায় ফিরে আসে, তা হলে পিতা অম্লানবদনে তাকে গ্রহণ করে তার সকল দায়িত্ব পালন করবে। এ সম্পর্কে হাদীস শরীফে বর্ণিত হয়েছে:

"আমি কি তোমাকে সর্বোত্তম সদকার কথা বলন না? তোমার যে কন্যা তোমার কাছে ফিরে আসে অথচ তুমি ব্যতীত তার উপার্জনের কেউ নেই।"[69] অর্থাৎ এ অবস্থায় তার

---

[68] . সুনানু আবি দাউদ, ১৩তম খন্ড, হাদীস নং ৪৪৮০, পৃ. ৩৫৭৮; ইসলামিয়াত, পৃ. ৭৬।

[69] . সুনানু ইবনু মাজাহ, কিতাবুল আদাব, পৃ. ২৬৯।

ভরণপোষণসহ সকল দায়িত্ব গ্রহণ করা পিতার পক্ষে সর্বোত্তম সদকা।

বৈধ আয় থেকে প্রতিপালিত হবার অধিকার

নিজে যেমন হালাল উপার্জন দ্বারা জীবিকা নির্বাহ করা ওয়াজিব, তেমনি সন্তান প্রতিপালন বৈধ উপার্জন থেকে খরচ করা কর্তব্য। পুত্র সন্তান বলেগ না হওয়া পর্যন্ত এবং কন্যা বিবাহ না দেওয়া পর্যন্ত তাদের ভরণপোষণের দায়িত্ব তাদের পিতার উপর বর্তায়, তাঁর সামর্থ অনুযায়ী।[70] যেমন পবিত্র কুরআনে এরশাদ হয়েছে:

﴿وَعَلَى ٱلۡمَوۡلُودِ لَهُۥ رِزۡقُهُنَّ وَكِسۡوَتُهُنَّ بِٱلۡمَعۡرُوفِۚ لَا تُكَلَّفُ نَفۡسٌ إِلَّا وُسۡعَهَاۚ﴾

“জনকের কর্তব্য যথারীতি তাদের (মাতাগণের) ভরণপোষণ করা। কাহাকেও তার সাধ্যাতীত কার্যভার দেয়া হয় না।”[71] অবৈধ আয় যথা ঘুষ, চুরি, সুদ, প্রতারণা, অসৎকর্ম, নেছা, জুয়া ইত্যাদি উপায়ে অর্থ উপার্জন করে সন্তান প্রতিপালনের

---

[70] . বিধিবদ্ধ ইসলামী আইন, পৃ. ৬০১।

[71] . আল-কুরআন, ২:২৩৩

বিধান ইসলামে নেই। এ ধরনের অপকর্মের জন্যে সন্তানের কোন দায়িত্ব নেই। রাসূল (সা) বৈধ পন্থায় উপার্জনে উৎসাহিত করার নিমিত্তে এরশাদ করেন:

«طلب الرزق الحلال من أفضل الفرائض»

"হালাল জীবিকা উপার্জন করা সর্বাপেক্ষা বড় ফরজ বা কর্তব্য।"[72] অন্যত্র এরশাদ হয়েছে:

«سئل النبى (ص) عن افضل الكسب فقال بيع مبرور وعمل الرجل بيده.»

সাহাবীগণ একদা রাসূল (সা) কে জিজ্ঞাসা করলেন, কোন প্রকারের উপার্জন উত্তম? রাসূল (সা) বললেন, ব্যক্তির নিজ হাতে কাজের বিনিময় বা সুষ্ঠু ব্যবসালব্ধ মুনাফা।"[73] তাছাড়া নামাজ সমাপ্ত হলে আল্লাহর অনুগ্রহ বা জীবিকা অনুসন্ধানের জন্য জমিনে ছড়িয়ে পড়তে বলা হয়েছে। যেমন- এরশাদ হচ্ছে:

﴿فَإِذَا قُضِيَتِ ٱلصَّلَوٰةُ فَٱنتَشِرُواْ فِي ٱلۡأَرۡضِ وَٱبۡتَغُواْ مِن فَضۡلِ ٱللَّهِ وَٱذۡكُرُواْ ٱللَّهَ كَثِيرٗا لَّعَلَّكُمۡ تُفۡلِحُونَ﴾ [الجمعة:١٠]

---

72 . আবু বকর আহমাদ ইবন হুসাইন আল-বায়হাকী, আস-সুনানুল কুবরা, (বৈরুত: দারুল মা'আরিফ হি. ১৪০৬), শুয়াবুল ঈমান।

73 .মুসনাদের আহমাদ, হাদীস নং ৫২৭৬।

“সালাত সমাপ্ত হলে তোমরা পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়বে এবং আল্লাহর অনুগ্রহ সন্ধান করবে ও আল্লাহকে অধিক স্মরণ করবে, যাতে তোমরা সফলকাম হও।”[74] পিতা-মাতা, শিক্ষকসহ সকলেই সন্তান প্রতিপালনে দায়িত্বশীল ভূমিকা পালন করতে হবে। কেননা এ দায়িত্বের ব্যাপারে আল্লাহ্ তা’আলার নিকট জবাবদিহি করতে হবে। যেমন হাদীস শরীফে এসেছে:

«كلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته.»

“তোমরা প্রত্যেকেই (রাখালের মত) দেখাশুনাকারী, আর এ দেখাশুনার ব্যাপারে প্রত্যেকেই জবাবদিহি করতে হবে।”[75] আর আদর্শবান সন্তান দুনিয়াতে যেমন সুখ ও শান্তির কারণ তেমনি মৃত্যুর পরে ধন, বাহুবল ও প্রভাব প্রতিপত্তি যখন কোন কাজে লাগবে না তখন সৎ সন্তানই পরকালীন কল্যাণে আসবে। যেমন হাদীস শরীফে রাসূল (সা) এরশাদ করেছেন:

“আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত নিশ্চয় রাসূল(সা) এরশাদ করেছেন, যখন মানুষ এন্তেকাল করে তখন তার সমস্ত আমল

---

[74] . আল-কুরআন, ৬২:১০।

[75] . আবি যাকারিয়া ইয়াহিয়া ইবন শারফ আন-নাবাবী, রিয়াদুস সালেহীন, খ. ১ (ঢাকা: বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার, খৃ. ২০০৩), হাদীস নং ৩০০।

বন্দ হয়ে যায়, তবে তিনটি কাজ যার প্রতিদান (এন্তেকালের পরেও) পেতে থাক। ১. এমন সদকা যার কল্যাণকারীতা চলতে থাকে, ২. এমন জ্ঞান যার দ্বারা মানুষ উপকৃত হ, ৩. এমন সৎকর্মশীল সন্তান যে তার পিতা-মাতার জন্য দোয় করে।"[76]

উপসংহারে বলা যায় শিশুকে সুস্থ্য, সবল ও আদর্শ মানুষ হিসেবে গড়ে তুলতে পিতা-মাতা এবং অভিভাবকদের দায়িত্ব ও কর্তব্য কতটুকু আর তাদের নিকট শিশুদের অধিকার কতটুকু এ বিষয়ে অত্র প্রবন্ধে দিক-নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে। তাছাড়া বর্তমানে আধুনিকতার অনুসারী এক শ্রেণীর মায়েরা নিজেদের সৌন্দর্যহানীর ভয় ও আভিজাত্য রক্ষার্থে স্তন্যদানে অনীহা প্রকাশ করে থাকে। এ প্রবন্ধে আলোচিত স্তন্যদানের ইসলামী এবং বৈজ্ঞানিক গুরুত্ব ও তাৎপর্য তাদেরকে দুগ্ধদানে অনুপ্রাণিত ও উৎসাহিত করবে। ফলে নতুন প্রজন্ম তাদের ন্যায্য অধিকার পেয়ে সুস্থ্য সবল ও আদর্শ সুনাগরিক হিসেবে গড়ে উঠার সুযোগ পাবে। আমার এ ক্ষুদ্র প্রয়াস শিশু অধিকার প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে সামান্যতম ভূমিকা রাখলে আমার শ্রম স্বার্থক হবে। আমিন।

---

[76] . মুসলিম ইব্ন আল-হাজ্জাজ আল-কুশাইরী, সহীহ মুসলিম, ৩. খ, পৃ. ১২৫৫।